পঞ্চম অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্যে সমাজচিত্র ঃ তুলনামূলক আলোচনা

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যধারার অন্যতম কাব্য মঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্যধারায় মনসামঙ্গল কাব্য প্রাচীনতম। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কবির দ্বারা লিখিত হলেও মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যের মতো মনসামঙ্গল কাব্যধারার কোন একজন কবির কাব্য একক ভাবে ততটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। এর কারণ সম্ভবত মুকুন্দরামের মতো কোনো প্রথম শ্রেণীর কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন নি। মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের প্রধান লক্ষ্য মনসার দৈবী মাহাত্ম্য ও মর্ত্যে পূজা প্রচারের বর্ণনা। জীবনকে নানা কোণ থেকে দেখা, জীবনের উষ্ণতাকে উপলব্ধি করা, রূঢ় বাস্তবতার স্বরূপ উপলব্ধি করা এসবই মনসামঙ্গল কাব্যে তুলনামূলকভাবে কম। তবে যেটুকু আছে তাকে কিন্তু অবহেলা করা চলে না। প্রসঙ্গত স্মরণ রাখতে হয়, মঙ্গলকাব্য সংসারে মনসামঙ্গলে প্রায় ৪০০ (চারশো) বছরের সামাজিক ইতিহাসের ছবিটি ইতঃস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আবার কবিরা যেহেতু সামাজিক মানুষ তাই কাব্য লিখতে গিয়ে সমাজকে তাঁরা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন তাও নয়। তাই মনসামঙ্গল কাব্যের কোন একজন কবির রচনায় চন্ডীমঙ্গলের মুকুন্দরামের কাব্যের মতো জনজীবনের নানাদিকের বিচিত্র চিত্র না খুঁজে বিভিন্ন কবির রচনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে সামাজিক অভিজ্ঞানের রেণুগুলি আছে তাদের জোড়া দিয়ে সমাজের জীবনধারার একটি চিত্র তৈরী করার প্রয়াস করা যায়। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো, মনসামঙ্গল এমন অনেক সামাজিক প্রসঙ্গ আছে যা হয়তো একজন কবিই উল্লেখ করেছেন অন্য কোনো ধারার এমনকি সমধর্মী ধারার কোন কবিও তার উল্লেখ করেন নি। এসব ক্ষেত্রে আমরা যাঁর রচনায় এসব বিক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ পাব তারও উল্লেখ করব। অর্থাৎ এই অংশে আমাদের আলোচনা তিন রকমভাবে এগিয়ে যাবে — (ক) বিভিন্ন কবির রচনা থেকে প্রাপ্ত সামাজিক প্রসঙ্গের তুলনামূলক আলোচনা। (খ) কবিদের সমধর্মী রচনা জুড়ে দিয়ে সমাজের এক অখন্ড ছবি তুলে ধরা। (গ) বিক্ষিপ্ত সামাজিক প্রসঙ্গগুলিকে উপস্থাপন করা।

আমরা জানি মানবদেহের মতো সমাজও অনেক উপাদান উপকরণের যোগে একটি অখন্ড সত্তারূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তাকে উপাদান উপকরণের ভিত্তিতে দেখতে হবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশে কৃষিজীবী অষ্ট্রিক ভাষাভাষী কৌমগুলির সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা ছিল একান্তভাবে গ্রামকেন্দ্রিক। মূলতঃ গ্রামকে কেন্দ্র করেই মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহ হতো। তাই গ্রামগুলি ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। সেকালের সমাজ মূলতঃ কৃষিপ্রধান হলেও ব্যবসায়ী (চাঁদবেনে, সায়বেনে,) ও শৈল্পিক গোষ্ঠীর (কেশাই, বিশ্বকর্মা) বাস ছিল গ্রামে। গ্রামে জেলে (জালুমালু) ডোম, নাপিত প্রভৃতি জাতিরাও

বসবাস করত। মুসলমানরা কোন এলাকায় পাশাপাশি স্বতন্ত্রপাড়ায় বসবাস করত। "হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক আচারের পার্থক্যবশতঃ তারা প্রতিবেশী হয়েও বিচ্ছিন্নভাবে বাস করত। 'কবিকঙ্কণচন্ডী'তে নূতন নগর পত্তনের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে বড় বড় নগরে মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র পাড়ায় বাস করিত। গ্রামেও সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থা ছিল।"[১] পূর্ববঙ্গের কবি বিজয়গুপ্ত ও দ্বিজবংশীর কাব্যে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের নাম হাসান হাটী; বিপ্রদাসের কাব্যে হাসান নগর।

হাসানহাটী থেকে হাসান নগর একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন। সমাজস্তরে হাটী প্রথম দিকের অবস্থা। হাট গ্রাম সমাজের পক্ষে প্রয়োজন। কতকগুলি গ্রামের কোন মধ্যস্থলে বা সুবিধাজনক জায়গায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ক্রয়বিক্রয়ের জন্য হাট বসে। কিন্তু ক্রমে যদি ঐ হাটকে ঘিরে নিত্য কেনা বেচার ব্যবস্থা হয় তাহলে সেখানে দোকান বাজার গড়ে ওঠে। তখন তা হয় গঞ্জ। সেখানে জিনিসপত্র বিক্রয় হয় চালান হয়। ক্রমে যদি ঐ অঞ্চলে জনবসতি বৃদ্ধি পায় দৈনন্দিন ব্যবসার সম্প্রসারণ হয়, বহুলোকের অর্থনৈতিক কাজের কেন্দ্র হিসেবে ঐ অঞ্চলটি গুরুত্ব পায় এবং তার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও ক্রমে টোল, মাদ্রাসা বা অন্যান্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তখন তা নগরে পরিণত হয়। বিজয়গুপ্ত বা দ্বিজবংশীর কাব্যে হাসানহাটী বিপ্রদাসের কাব্যে হাসান নগরে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে এই নগরায়ণ প্রক্রিয়া কাজ করতে পারে। দ্বিতীয়ত হাসানহাটী হয়ত নগর হয় নি। কিন্তু বিপ্রদাসের কালে নগরায়ণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হেতু হাসানহাটির উপর সেই অবস্থার আরোপ কবি কল্পনায় হওয়া সম্ভব। এজন্য বিপ্রদাসের কাব্যে হাসান নগর হতে পারে। কবি হাসানদের নিবাস স্থলকে নগররূপে দেখে তার মর্যাদা, সমৃদ্ধি এবং বিস্তারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই গুরুত্ব পূর্ববর্তী দুই কবির কাব্যে নেই।

মনসামঙ্গল কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ক যে প্রসঙ্গ পাই তাতে দেখা যায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ প্রায় লেগেই থাকতো। হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের অত্যাচার ছিল প্রবল। মুসলমানরা নিজেরা শাস্তি দিতে না পারলে কাজির কাছে নালিশ করত। তখন কাজীরা অতিরিক্ত উৎসাহবশত হিন্দুদের ধর্মকাজে নানারকম বাধা দিত।[২] হিন্দুরা সুযোগ পেলে তার প্রতিশোধ নিত। এরকম প্রতিশোধ নেবার পক্ষে তাদের বেশী সুযোগ ছিল না। মনে হয় এখানে কাল্পনিকভাবে মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছে। হিন্দুরা এই প্রতিশোধ বাস্তবে নিতে পারে নি বলে মনসার মাধ্যমে নিয়েছে। বিভিন্ন কবির কাব্যে এই চিত্রের বর্ণনা পাই —

(ক) কাতর হইয়া বলে শুন বাপ ভাই।
তোমার বাপের পুণ্যে ছাড়ি দেও যাই।।
আপনার কার্য্য সবে কর মন মত।
এই কথা না কহিব কাজির সাক্ষাত।।

বা — খোদা তাল্লার দিব্য কর মাথায় দিয়া হাত।
এসব বাত না কহিবা কাজির সাক্ষাত।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা-১২৪)

(খ) ধর ধর মার মার বলে গোপগণে।
মিঞা সব পলাইল ভয় প্যায়া মনে।।

* * *

তার পরে ছাড়ি দিল দুর্বল দেখিয়া।
স্নান করি পদ্মা পূজে হরষিত হৈয়া।। (দ্বিঃব/পৃষ্ঠা - ১৭৮)

একটা জিনিস লক্ষণীয়, বিজয়গুপ্ত যে বর্ণনা দিয়েছেন দ্বিজবংশীর বর্ণনা তার চেয়ে অনেক সংযত। বিজয়গুপ্ত মুসলমানের উপর হিন্দুর প্রতিশোধ নেওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। মনে হয় এটা হিন্দু-মুসলমান সংঘাতপর্বের প্রথম দিকের বর্ণনা। যখন হিন্দুর সেই স্পৃহা ও শক্তি ছিল। অন্যপক্ষে দ্বিজবংশীর কাব্যে দেখি হিন্দুর ক্ষমাধর্ম প্রবল। মুসলমানরা পালিয়ে গেছে বলেই তিনি সন্তুষ্ট। দুর্বল মুসলমানকে তিনি রেহাইও দিয়েছেন। এর দ্বারা বোঝা যায় —

(ক) হিন্দু মুসলমানের সমাজে পাশাপাশি অবস্থান হেতু সম্পর্কের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। এজন্য অত্যাচার-পীড়ন অপেক্ষা ক্ষমা সে জায়গায় স্থান পেয়েছে।

(খ) সম্ভবত মুসলমানদের শক্তি সর্বত্র এমন বিস্তৃত হয়েছে যে হিন্দুরা এখন আর তাদের উপর বল প্রয়োগ করতে সাহস পায় না। কেবল একটু তর্জন গর্জন করেই সেকাজ সম্পন্ন করে।

মুসলমানদের মনে হিন্দুবিদ্বেষও প্রবল ছিল।

বিজয়গুপ্তের — যদি গিয়া লাগ পাম যতেক হিন্দুয়া।
জাতি নাশ করিব আজি গোস্ত খিলাইয়া।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা-১২৭)

দ্বিজবংশীর কাব্যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ সজ্জার ঘটনা থেকেও এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সাজ সাজ বলিয়া হাসন পাড়ে ডাক।
এক ডাকে বাহিরিল খোজা তিন লাখ।।
খলিফা সমান সাজি খোজার প্রধান।
তার সঙ্গে সাজি আইল হাজার পাঠান।

* * *

ঘন ঘন সাড়া পড়িল নগরে।
একজন মুসলমান না রৈল সহরে।। (দ্বিঃব/পৃষ্ঠা-১৮০)

দ্বিজ বংশীর এই বর্ণনা থেকে মুসলমান সমাজের সামাজিক বিন্যাসের পরিচয়টি অনুমান করতে পারি। মুসলমান সমাজে শেখ, সঈদ, কাজি, মোল্লা, খোজা, শেখজাদা, খলিফা, পাঠান, মুরসিদ ইত্যাদি শ্রেণীর মুসলমান বাস করতেন। বিপ্রদাসের কাব্যে মুসলিম শাসকগণের প্রজাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং মুসলমান রাজার রাজপরিবারের সুখী সন্তুষ্ট জীবনচিত্র পাওয়া যায়।

হাসনের বাঁদি ধায় রথ-ভরে মনসায়
প্রবেশিল হাসন-নগরে।
সুবর্ণরচিত পুরী ঘর শোভে সারি সারি
নৃত্যগীত আনন্দ বিস্তরে।।
বৈসে জত প্রজাগণ সভে অতি বিচক্ষণ
নানারত্নে শোভে কলেবর।
রূপে গুণে মনোহর দীপ্ত জেন দিবাকর
প্রজায় বেষ্টিত নিরন্তর।।
পদ্মা প্রবেশিয়া হাসানের পুরী
নাহি কিছু দুঃখ শোক সদা আনন্দিত লোক
দেখিয়া কৌতুকী বিষহরি। (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ৬৬-৬৭)

তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় তীর্থস্থান, রাজধানী, নদীপথের বিভিন্ন ব্যবসায়িক কেন্দ্রকে অবলম্বন করে নগর বা শহর গড়ে উঠছিল। মনসামঙ্গলের পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার কবি বিপ্রদাস সপ্তগ্রাম, (ব্যবসায়িক কেন্দ্র) ত্রিবেণী (তীর্থস্থান) প্রভৃতি স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নগরচিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। বিপ্রদাস সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীনগরের প্রাচুর্য ও সেখানকার মানুষের ভক্তির বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন—

অভিনব সুরপুরী দেখি ঘর সারি সারি
প্রতি ঘরে কণকের বারা
নানা রত্ন অবিশাল জ্যোতির্ময় কাঁচ চাল
গজমুক্তা প্রলম্বিত ঝারা
সভে দেবে ভক্তি অতি প্রতি ঘরে নানা মূর্তি
রত্নময় সকল প্রাসাদে
আনন্দে বাজায় বাদ্দি শঙ্খ ঘটা মৃদঙ্গাদি
দেখি রাজা বড়ই প্রমোদে।। (বিঃপি/পৃষ্ঠা-১৪৩),

এই ধারার অপর কবি কেতকাদাস কেবল ত্রিবেণীর উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গীয় ধারার কবি ত্রিবেণীর উল্লেখ করে বলেন চাঁদ সেখানে উপস্থিত হয়ে স্নান ও তর্পণ করেন।

মজিলে মজিলে সাধু যায় দিনে দিনে।

স্নান তর্পণ করে ত্রিবেণী নদী-স্থানে।। (জঃঘো/পৃষ্ঠা-১২৮)

আবার এই ধারার কবি তন্ত্রবিভূতি ত্রিবেণীর গঙ্গা নয় ভাগীরথীর জলে স্নান করাকে পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেন। তাঁর কাব্যে চাঁদের বাণিজ্য ডিঙ্গা ভাগীরথীতে পৌছানো মাত্র মনা কান্ডারীকে তিনি সেখানে অপেক্ষা করতে বলেন এবং পতিত পাবনী গঙ্গার মর্ত্য অবতরণ কাহিনী শুনতে চান। অতঃপর কান্ডারীর মুখে ভগীরথের গঙ্গা আনার বৃত্তান্ত ও গঙ্গার মাহাত্ম্য শুনে চাঁদ গঙ্গাজলে তর্পণ করেন এবং শিব পূজা শেষে গঙ্গার অর্চ্চনা করেন। অতঃপর প্রয়াগে ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমের গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন।

ত্রিবেণীর মহিমা কি বলিবারে পারি।

সেই জল পরশিলে জায় স্বর্গপুরী।। (তঃবি/পৃষ্ঠা-১৫১)

আবার পূর্ববঙ্গের কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যে সুরা নদীর তীরে পবিত্র তীর্থস্থানে চাঁদ স্নান করে ত্রিলোচনসহ অন্যান্য দেবতাদের পূজা করেন।

সুরা নদী তীরে তীর্থ বড় পুণ্যবাণ।
সেই নদীতে চৌদ্দ ডিঙ্গা করিল লাগান।।
স্নান করিয়া চান্দো পুজে দেবগণ।
পুষ্পজল দিয়ে পোজে দেব ত্রিলোচন।। (বিঃগু/ পৃষ্ঠা-২৪৫)

এখন উপরের কবিদের এই বর্ণনাংশের তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায় বিপ্রদাস প্রত্যক্ষভাবে নগরের চিত্র বর্ণনা করেছেন, অন্যান্য কবিরা (তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, বিজয়গুপ্ত প্রমুখ কবি) পরোক্ষে নগরের কথা বলতে গিয়ে সেখানকার মানুষদের ভক্তিবাদের পরিচয় দিয়েছেন। বিপ্রদাস শুধু নগরের বর্ণনায় করেন নি, সেই নগরে বিভিন্ন জাতিরা কিভাবে ক্রমান্বয়ে বসবাস করতেন তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেন।

প্রথমে ব্রাহ্মণ বৈসে জানে শাস্ত্রনীত
ক্ষেত্রি বৈশ্য বৈদ্য বৈসে কাএস্থ হরষিত।
ভট্ট দৈবজ্ঞ গোপ বারই কুমার
পঞ্চ বণিক বৈসে আর কর্মকার।
বাদ্যপূরক কলু কুশলি কাঠ্যরা
শাঁখারি কাঁসারি বৈসে তামালি সেকরা।
তাঁতি জুগী মালাকার রজক নাপিত
ছুথার গাড়ার বৈসে হৈয়া হরষিত।

ধীবর তিয়র মালা বৈসে নদীকূলে

হরিষে ছত্রিশ জাতি বৈসে কুতূহলে। (বিঃপি/পৃষ্ঠা-১৯)

বিপ্রদাস ছাড়া নগরে বসবাসরত নাগরিকদের এরূপ ছবি মনসামঙ্গলের কোন কবি অঙ্কন করেন নি।

প্রাচীনকালের বাংলাভাষার আদিতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকেই আমরা জানতে পারি উঁচু উঁচু পর্বতের টিলার উপর ঘরবাড়ি নির্মাণের কথা; মধ্যযুগেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। কবি বিপ্রদাসের কাব্যে বিশ্বকর্মা মনসার জন্য পুরী নির্মাণ করেছেন অনুচ্চ পাহাড়ের মাথায়। এই পুরী নির্মাণে বিশ্বকর্মার শৈল্পিক নৈপুণ্যের পরিচয় থাকলেও তা নির্মিত হয় বিশাই, কেশাই প্রভৃতি কর্মকার গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের পরিশ্রমে। ধাতুশিল্পে কামারদের ছিল একচেটিয়া অধিকার। মূলত তারাই গৃহ, ভাস্কর্য ও ধাতুশিল্পের নির্মাণে একাধিপত্যের পরিচয় দেন।

মনসামঙ্গলে লোহার ঘর নির্মাণের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে সেকালে সত্যিসত্যি যে লোহার ঘর তৈরী করা হোত তা মনে হয় না। লোহার ঘরের কোন নিদর্শন এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। মনে হয় অভেদ্য গৃহ-ই লৌহবাসর বা লোহার বাসগৃহ। নারায়ণদেবের বর্ণনা থেকে জানা যায় ছাউনি দিয়ে চৌচালা বাড়ী নির্মাণের কথা —

সুনিয়াত কর্ম্মকার জায় গৃহ গঠিবার

আসি দোকান পাতিল সত্তর।

চারি প্রহর রাতি গঠিল লোহার পাতি

একত্র করি চারি চাল বসাইল সুন্দর। (নাঃদে/পৃষ্ঠা-২৫৮)

দ্বিজ বংশীদাস নারায়ণদেবের মতো চৌচালা ছাউনির কথা বলেও এর অতিরিক্ত ঘরের চূড়া, চূড়ায় পিতলের কলসী বসিয়ে শোভা বর্ধন করা ইত্যাদির কথা বলেছেন। দ্বিজবংশী দাস ঘরের পূর্বদিকে দ্বার, লোহার কপাট, চুন খোয়া দিয়ে ঘরের দেওয়াল গড়ার কথা বলেন —

পূর্ব্বমুখে রাখি দ্বার গড়িল কপাট তার

কুলুপ গড়িল অলক্ষিতে।

কড়াড়ে জড়িয়ে লোহা তার পড়ে চুন খোহা

দুলঙ্গ গড়িল চারি ভিতে। (দ্বিঃব/পৃষ্ঠা-৪৭৫)

বাড়ী তৈরী হলে চারিদিকে উঁচু প্রাচীর দেওয়া হত। তার উপর ক্ষুরধার লোহার কাঁটা দিয়ে বাড়ীকে অভেদ্য করে তোলা হতো। সম্ভবত মনসামঙ্গলের কবিরা লোহার ঘর বলতে লোহার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা গৃহকেই বোঝাতেন।

পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কবিদের রচনায় না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের কবি বিপ্রদাস মন্দির বা মন্দিরের কারুকার্য নির্মাণের বর্ণনা সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কাব্যে মনসার নিকট পর্যুদস্ত হাসন-হুসেন মনসার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে তাঁর নিত্যপূজার ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্যের গুণবান শিল্পীদের দিয়ে রাজ্যে মন্দির নির্মাণের আদেশ দেন —

আজ্ঞা-মাত্রে শিল্পকার সূত্র ধরে চারিধার
পাষাণে গাঁথয়ে মনোহর
করিয়া বিচিত্র চিত্র মন্দির গঠ এ তত্র
দেখিয়া হরিষ নৃপবর।
বিচিত্র দেয়াল গাঁথে নানা চিত্র করে তাথে
নানা বর্ণে মুরতি আপার। (বিঃপি/পৃষ্ঠা-৮২)

কবি বিপ্রদাসের মন্দির নির্মাণের এই বর্ণনা পূর্বের ঘরবাড়ি নির্মাণের বর্ণনা থেকে পৃথক। মন্দির যে বসবাসের স্থান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তা বোঝাবার জন্য তিনি মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে বিচিত্র দেব দেবতার চিত্র আঁকিয়েছেন। তখন মন্দিরের দেওয়াল গাঁথা হতো পাথরের খন্ড দিয়ে। মন্দিরের চূড়া রূপার পাত দিয়ে মোড়া হত, দরজায় ব্যবহৃত হত সোনার ছিটকিনি। মন্দিরের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্য গজমুকুতার ঝারা দিয়ে চারিদিক সাজানো হোত। সব মিলিয়ে মন্দিরের রূপ ভক্তি প্রবণ মানুষকে আকর্ষণ করত — "জেন দেখি কৈলাস-ভুবন।" — (বিঃপি/পৃষ্ঠা-৮৩)

কবি তন্ত্রবিভূতি বেহুলার ভাসানের সময় মাঞ্জস নির্মাণের যে বর্ণনা দেন তাতেও কবির শিল্পী সত্তার পরিচয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

সুবর্ণের পাইর দিল সুবর্ণ চোচাল।
চৌদিকে বোড়িঞা দিল সুবর্ণের জাল।।
মঞ্জুস উপরে দিল সুবর্ণ কলস।
নেতের পতাকা উড়ে দেখিতে রূপস।। (তঃবি/পৃষ্ঠা - ৩৮৮)

মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদের বানিজ্য যাত্রার সময় বিপ্রদাসের ও কেতকাদাসের কাব্যে নৌকা নির্মাণের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা তৎকালীন শিল্পী গোষ্ঠীর তক্ষণ শিল্পের নৈপুণ্যের পরিচয়টিকেই দীপ্ত করে। মনসামঙ্গলের অন্য কবি বিজয়গুপ্ত বানিজ্য যাত্রার সময় চাঁদ যে নৌকা ব্যবহার করেন তার নামের উল্লেখ করলেও (মঙ্গলা, চন্দ্রপাট, হাসমড়া, মগর, গুয়ারেখী, সুমন্ত বহাল, সিংহমুখ, চন্দ্ররেখা/পৃষ্ঠা - ২৪২/২৪৩) নৌকা তৈরীর পন্থা পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি। কেতকাদাস ও তন্ত্রবিভূতি নৌকা নির্মাণের বর্ণনা দিয়েছেন—

মহাবীর হনুমান ঃ সাধুর ইঙ্গিত পান ঃ কাষ্ঠ আনিবারে কৈল গতি।
উপাড়িয়া একটানে ঃ শত শত বৃক্ষ আনে ঃ শাল পিয়াল নানাজাতি।।
তারপর — বিশ্বকর্ম্মা যত চানঃ আন্যা দেই হনুমান ঃ সপ্ত ডিঙ্গা গড়ে হরষিতে।
বিংশতি চৌষট্টি গজে ঃ একখান ডিঙ্গা সাজে ঃ লোহার গজাল বিরচিতে।।
চাঁদবান্যা মধুকর ঃ মাঝে বান্ধে ছইঘর ঃ নানা চিত্র করিল বিশাই।
সপ্ত ডিঙ্গা নির্ম্মাইয়া ঃ মনে হরষিত হয়্যা ঃ বিশ্বকর্ম্মা নিজ পুরী যাই।।

তন্ত্রবিভূতির কাব্যে প্রথমে কাঠ কেটে নৌকা তৈরীর কথা বলা হয়েছে।

শাল শিয়াল কাটে ঘিরিনি তেতলি।
কাটিল নিম্বের গাছ গাম্ভারি পারলি।।
আম্র কাঠাল কাটে বেল্য বকুল।
বড় বড় কাষ্ঠ কাটে কাঞ্চনের মূল।।
চাম্পা ঘিরিনি কাটিয়া করিল সারি সারি।
চিরিয়া করিল ফালি তিন লক্ষ চারি।। (তঃবি/পৃষ্ঠা - ১৩৬)

তারপর এই কাঠ দিয়ে চৌদ্দ খানি নৌকা তৈরী করা হয়।

প্রথমে বান্ধিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
বাঘমুখা ভেড়ামুখা ধাউড়া ভ্রমর।।
শীতলপাটী উটমুখী গোটা কুচবন্ধ।
বান্ধিল মোহনগিরি পরম আনন্দ।।
মরঙ্গিয়া জাহাজ গোড়া পালসোই।
চৌদ্দ ডিঙ্গা করে আগে বানিয়ার ঠাই।। (তঃবি/পৃষ্ঠা - ১৩৬)

অর্থাৎ কেতকাদাসের বিবরণ থেকে বোঝা যায় সেকালে বিভিন্ন আয়তনের নৌকা তৈরী হতো। আয়তনের মাপ হত কুড়ি থেকে চৌষট্টি গজের মধ্যে। বিপ্রদাস কেতকাদাসের মতো নৌকার আয়তনের কথা বলতে গিয়ে নির্দিষ্ট করে মাপের উল্লেখ না করলেও দীর্ঘ নৌকার উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাব্যে সর্বজয়া, জগদ্দল, সুমঙ্গল, শশিমুখী, নবরত্ন, চিত্ররেখা (পৃষ্ঠা - ১৪২) ইত্যাদি নৌকার নাম পাওয়া যায়।

মধ্যযুগে বাঙালীর হস্তশিল্পে দক্ষতা ছিল উল্লেখ করার মতো। হস্ত শিল্পের মধ্যে অন্যতম ছিল বাঁশ ও বেতের কাজ। বিচিত্র নক্সা যুক্ত ধুচনি, রঙ্গন চুপড়ি, বিউনি, চালুনি, ঝাটা, টোকা, ছাতা প্রভৃতি ছিল কাজের অঙ্গ এবং সারা বাংলাদেশে একচ্ছত্র অধিকার ছিল ডোম জাতির। নীচের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায় —

(ক) জাতি সভাবে বেচি খারি আর বিচুনি। (নাঃ দে/পৃষ্ঠা - ২৭৬)

(খ) বাঁশ কাটিয়া বেহুলা বিচলী বুনিল।
ডোমনীর বেশ ধরি বেহুলা চলিল।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৫২৩)

(গ) বালি বলে, "ডোমকূলে আমার উৎপতি।
চাঁপালি নগরে ঘর আমি ডোমজাতি।।
ঘরেত নাহিক অন্ন উপবাসে মরি।
বিচনি লইয়া মাতা আইলাম তব বাড়ী।।
কুলের ব্যবসা আমার জানে সর্বজন।
মূল্য দিয়া লহ তুমি অমূল্য বিচন।। (জীঃমৈ/পৃষ্ঠা - ২৪৮ বাইশা)

ঘ) মউর পেখম গতি শিরে লইয়া টোকা ছাতি
ঝাঁপি ক্ষেমি চুপড়ি বিয়নি। (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ২২৪)

ডোমনীর চুপড়ি, বিয়নি বেচার দৃষ্টান্ত বিষ্ণুপাল (পৃষ্ঠা - ১২৮) তন্ত্রবিভূতি (পৃষ্ঠা - ৫২৬) জগজ্জীবন ঘোষালের (পৃষ্ঠা - ৩৩৯) কাব্যেও পাওয়া যায়। সুতরাং উপরের এই আলোচনা থেকে আমরা দুরকম অনুমান করতে পারি —

ক) তখন বাঁশের কাজে সারা বাংলাদেশে ডোমজাতির প্রশংসনীয় প্রভাব ছিল।

খ) জীবন মৈত্রের সমাজে হস্তশিল্পে নিযুক্ত ডোমজাতির আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না।

হস্তশিল্পের মতো মনসামঙ্গল কাব্যে বয়ন শিল্পেরও উল্লেখ আছে। খোম (শনের সূতোয় প্রস্তুত মোটা কাপড় —

ক) খোম ধুতি কুড়ি যত দেখায় রাজন।' (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ১৪৯),

পরিপট্ট (পাটের কাপড়) খ) পরিপট্ট সাড়ি কটীতে তক্ষক' (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৩৯০) কিংবা

গ) বিচিত্র পট্টচীর মনসা অতিধীর
জিনিয়া জ্যোতি দিবাকর। (জঃঘোঃ/পৃষ্ঠা - ২৯৪)

পাড়ি পাছুড়ি (মোটা চাদর বা বস্ত্রাঞ্চল), মেঘডম্বুর — ('মেঘডম্বুর শাড়ি তবে পরে বানিয়ানী' (জঃঘোঃ/পৃষ্ঠা - ২৯৬) গুজরাটী — 'গুর্জ্জরাটি অম্বর করিল পরিধান' (জঃঘো/পৃষ্ঠা - ১৯৪) ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদির উল্লেখ পাওয়া যায় প্রচুর।

যদিও বিপ্রদাস ছাড়া আর কোন কবি কাঁচলি নির্মাণের বর্ণনা দেন নি। তবু অনুমিত হয় পশ্চিমবাংলায় সূচী শিল্পেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। কাঁচলিতে ভারতপুরাণ, কালীয়দমন, বিভিন্ন পশুপক্ষী, দেবদেবীর ও বিচিত্র নক্সা অঙ্কন (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ১৮৯) প্রধানত সূচী শিল্পের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তখনকার শিল্পীরা

শুধুমাত্র কাঁচলি নির্মাণই করতেন না, পুরানো কাঁচলি কোনো কারণে নষ্ট হলে বা ছিঁড়ে গেলে অর্থের বিনিময়ে তা সেলাই করে সারিয়েও দিতেন।

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসার ঘটেছিল বাংলাদেশে। নদনদীর প্রাচুর্য হেতু শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণের সুবিধা ছিল জলপথে। তাই দেশের নানাস্থানে বানিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। মনসামঙ্গলের কবিরা বানিজ্যের যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়েছেন —

বিপ্রদাস —	ত্রিবেণী, কুমারহট্ট, হুগলী, ভাটপাড়া, কাঁকীনাড়া, মূলাজোড় গারুলিয়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হাদিয়াদহ, কাড়িয়াদহ, জোকাদহ, সিংহদহ।	(পৃষ্ঠা-১৪২ - ১৪৪)
কেতকাদাস —	ত্রিবেণী, নবহট্ট, কুমারহট্ট, কাঁঠালপাড়া, ভাটপাড়া ইত্যাদি।	(পৃষ্ঠা - ২২৪)
জগজ্জীবন —	গগড়িয়া, ভ্রমরাদহ	(পৃষ্ঠা - ১২৬)

যাত্রাপথের এই বর্ণনায় সিংহল দ্বীপের কথা থাকলেও তা নিছকই কল্পনা। কবিদের বর্ণিত স্থাননাম হয় কল্পিত, নয়, দেশের মধ্যে অবস্থিত। তাছাড়া মধ্যযুগে বাঙালীর বহির্বাণিজ্য ক্রমশ মন্দীভূত হতে থাকে। "অষ্টম শতকের পর বৈদেশিক বানিজ্যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হওয়ার পরে বহুদিন এই পথের কথা আর শোনা যায় না;...।"[৩] কাব্যের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকেও ব্যবসায় মন্দার ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেহুলার বিয়েতে নানা যৌতুক দেওয়ার সময় বেহুলার মা সুমিত্রা সাহো রাজাকে একখানি তালুক দেওয়ার জন্য বলেন।

ভাল চাইয়া একখানি তালুকদেও তুমি
থাকে যেন এক সত খামার।।
জামাই না যায় জেন দেসান্তর না হয় জেন সদাগর
না করে জেন বানির্য্যেত মন।। (নাঃদে/পৃষ্ঠা - ৪৬)

কাজেই বানিজ্য হিসাবে যা কিছু প্রচলিত ছিল তা সবই দেশের ভেতরে সীমাবদ্ধ। তখন বানিজ্যের মাধ্যম ছিল বিনিময় প্রথা (Burter System)[৪] অর্থাৎ এক দ্রব্যাদির বদলে আর এক দ্রব্যাদি কেনা বা বিক্রী করা হোত।

পূর্ব্ববঙ্গের কবি বিজয়গুপ্ত তাঁর কাব্যে 'বস্তুবদল পালা' নামে একটি পালা সংযোজন করেন। তাঁর কাব্যে যে বস্তুগুলি বদল হয় তার তালিকা তৈরী করলে এরূপ দাঁড়ায় —

বদল দ্রব্য	বদলপ্রাপ্ত দ্রব্য
হরিদ্রা বা হলুদ	সোনা
মুসুর	হিঙ্গুল
নওস	জাতিফল ও লবঙ্গ
ছাগল	হরিণ

বারকোস	পিতলের থাল
কুকুর	মেড়া
ঘৃত ও মধু	বাটি বাটি রস
কবুতর	সাড়াব
চড়া	ময়না (পৃষ্ঠাঃ ২৭৩ - ৭৫)

এরকম বদল দ্রব্যের তালিকা বিপ্রদাস, তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবনের বর্ণনা থেকেও তৈরী করা যায়।

বিপ্রদাসে —

হরিদ্রা বা হলুদের	পরিবর্তে	সোনা
খোম ধুতি		পাটবস্ত্র
পাড়ু কুমড়া		সিসার টুকরা
মেষ		অশ্ব, হস্তী
তন্ডুল		মুকুতা বা মুক্তা
পিপলি জোয়ান, কালোজিরা		গুড়ঞ্চক, মরিচ, লবঙ্গ
নিমপাতা, আমলকি, হরিতকি		জায়ফল, জইত্রি, কর্পূর, হিঙ্গ,
শুক্তো পত্র		তেজপাতা (পৃষ্ঠা - ১৪৯)

তন্ত্রবিভূতিতে —	একটি নারিকেলের	পরিবর্তে	দশটি শঙ্খ
	শাড়ি		পাটের বসন
	গুয়া		পাখীর ছানা
	হলুদ		সোনা
	সুকুতা		মুকুতা
	ফুলবড়ি		১০ গুণ কোড়ি
	আমরা		জায়ফল
	জিরা		হীরা
	কস্তুরী		অমৃতের ফল
	সোন		শ্বেত চামর (পৃষ্ঠাঃ ১৭১ - ১৭৩)
জগজ্জীবনে —	একটি নারিকেলের	পরিবর্তে	১০ টি শঙ্খ
	হলুদ		সোনা
	শাড়ি		পাটের বসন
	ফুলবড়ি		১০ গুণ কোড়ি
	গুয়া		পক্ষীছায় বা পক্ষীছানা (পৃষ্ঠাঃ ১৩৮)

উপরের এই তালিকা বর্ণনার প্রতিক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে চাঁদ কথার চাতুরীতে বিপুল পরিমাণ লাভ করেছেন। তন্ত্রবিভূতি চাঁদের বদল বানিজ্য শুরুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর বসার ও হেসে হেসে কথা বলার যে চিত্র

অঙ্কন করেছেন তা চাতুরী পূর্ণ এক অভিজ্ঞ বণিকের চিত্র।

রাজা বলে সদাগর কর অবধান।
দ্রব্য লেনি দেনি কর মোর বিদ্যমান।।
তারাজু নইয়া তবে বৈসে সদাগর।
দ্রব্য আনিল জত লায়ের গাবর।।
বিছানা করি বোসিলেন চান্দো অধিকারী।
রাজার সাক্ষাতে দ্রব্য থুইল সারি সারি।।
রাজা বোলে দ্রব্যের কার কত মুল।
সত্য করি কহ মিতা হাতে ধর্ম তুল।।
হাসিয়া উত্তর দিল সাধু অধিকারী।
বদল করিব দ্রব্য বিকাইতে নারি।। (তঃবি/পৃষ্ঠা - ১৭১)

বিজয়গুপ্তের কাব্যে চাঁদ চটের মহিমাগান গেয়ে চটকে দুর্মূল্য বস্তু বলে উপস্থাপন করে তার বদলে যে বিভিন্ন বস্তুর বদল চেয়েছেন তাও কথার চাতুরীতে ভর পুর।

তোমার দেশের কাছে আর যত দ্রব্য আছে
চট দিহা করহ বদল।।
নেতের বদল চাই সকল রাজ্যেত নাই
চট নাহি মিলে সর্বখানে।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ২৭২)

কথার চাতুরীতে তিনি প্রতিপক্ষের চোখে এমনভাবে ধূলা দিয়েছেন যা দেখে বিস্মিত হতে হয়। মুকুন্দরাম বণিক শ্রেণীর প্রতিনিধি রূপে মুরারী শীলকে এঁকেছেন। মনসামঙ্গলের কবিরাও চাঁদের মধ্যে বণিক বৃত্তির রূপ উদঘাটিত করেছেন। বদল হওয়া দ্রব্যের তালিকায় দৃষ্টি ফেললে দেখা যায় সব ধারার কবির কাব্যেই চাঁদ হলুদের পরিবর্তে সোনা দাবী করেছেন। এ থেকে দুটি জিনিস মনে হয়। প্রথমত চাঁদের বানিজ্য ক্ষেত্রে হলুদ খুবই মূল্যবান বস্তু ছিল — সোনা ছাড়া আর কিছু তার পরিবর্ত হতে পারে না। দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই যে বদল বানিজ্যের ক্ষেত্রে হলুদের বদলে সোনা একটা মঙ্গলকাব্যের বর্ণনা রীতিতে পর্যবসিত হয়েছিল। তা না হলে বিজয়গুপ্ত থেকে জগজ্জীবন পর্যন্ত কবিদের মধ্যে স্থান কাল নির্বিশেষে এমনটা হওয়া সম্ভব হত না। অন্যান্য দ্রব্যের উল্লেখে কবিতে কবিতে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের কারণ স্থান ও কালগত পার্থক্য। উত্তরবঙ্গের দুই কবির মধ্যে বদল বানিজ্যের হুবহু মিল আছে। কিন্তু পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গের কবিদের ক্ষেত্রে তা নেই। পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গের কবিদের ক্ষেত্রে মশলা দ্রব্যের আমদানির কথা দেখতে পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্ত কেবল জাতিফল ও লবঙ্গ আমদানির কথা বলেছেন। কিন্তু বিপ্রদাস পিপলি, জোয়ান, কালোজিরার বদলে গুড়গুক মরিচ, লবঙ্গ, জাইফল, জয়িত্রী প্রভৃতি আমদানির কথা বলেছেন। অন্যপক্ষে জগজ্জীবন ঘোষালের লেখা থেকে বাংলায় মশলা দ্রব্যের চাষের সংবাদ পাওয়া যায়। (জঃঘো/পৃষ্ঠা - ১০৪)

বিপ্রদাস বিজয়গুপ্তের কালে বাংলাদেশের পূর্ব বা পশ্চিমভূখন্ডে সম্ভবত এইসব জিনিসের চাষ তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। এর অতিরিক্ত উত্তরবঙ্গের কবিদের কাব্যে নারকেলের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। লঙ্কার রাজা চাঁদের মুখে নারকেলের মহিমাগান শুনে আকুল হয়েছেন। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় উত্তরবঙ্গে নারকেল চাষের আধিক্য ও শঙ্খের চিরকালীন অপ্রতুলতা। এই দুই বস্তুর বাস্তবতাকে কবিরা কৌশলে চাঁদের বাকচতুর কথোপকথনে সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। অনুমিত হয়, চাঁদ লঙ্কার রাজার কাছে নিজ বস্তুর গুণ তুলে ধরে তাঁর চাহিদার জিনিস হাতিয়ে নেওয়ার কৌশলে নারকেলের অধিক প্রশংসা করেছিলেন।

বিনিময় প্রথার কারণে এ সময় দেশে কি ধরণের মুদ্রার চল ছিল সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা প্রায় কঠিন হয়ে পড়ে। তবে পূর্ববঙ্গের সমাজে মুদ্রার রকমভেদ হিসেবে কড়ির প্রচলন ছিল। নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্তের কাব্যে বহু কষ্টে অর্জিত কড়ির বিনিময়ে চাঁদ নটী বাড়ী যাওয়ার কথা বলেছেন।

চান্দো বোলে অর্দ্ধেক কড়ি বৈসায়া খাইব।
আর অর্দ্ধেক কড়ি আমি নটীরে বিলাইব।। (নাঃদে/পৃষ্ঠা - ২১০)
একপণ কড়ি দিয়া ক্ষৌর শুদ্ধি হব।
আর এক পণ কড়ি দিয়া চিড়া কলা খাব।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ২৪৯)

উত্তরবঙ্গের দুই কবি ফুলবড়ির বদলে কড়ি নিয়েছেন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে কোন্ মুদ্রার প্রচলন ছিল তা সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় না। কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার কবি বিপ্রদাস মুদ্রা হিসেবে 'তঙ্কা' শব্দটির উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় মেলিল ডিঙ্গা নামে সর্ব্বজয়া।
দুলক্ষ তঙ্কার দ্রব্য তাহাতে ভরিয়া।। (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ১৪২)

এই 'তঙ্কা' ও 'টাকা' যদি সমার্থক হয় তবে বিপ্রদাসের প্রাচীনত্ব নিয়ে সন্দেহ জন্মায়। কেননা ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মনে করেন বাংলাদেশে টাকার প্রচলন শুরু হয় সপ্তদশ শতকে।[৫]

বিপ্রদাস সপ্তদশ শতকের অনেক আগের কবি। তাই কাব্যের এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও অনুরূপ মত পোষণ করেন।[৬] বিপ্রদাসের কাব্যে মুদ্রা ছাড়া ওজনের এককের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তখন ওজনের একক ছিল মন। ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ছিল যথাক্রমে তোলা, মাষ, রতি, পল ইত্যাদি —

তোলা মাষা রতি পল জার যে বুঝিয়া
সভাকারে বিষ পদ্মা দিলেন জুকিয়া। (বিঃপি/ পৃষ্ঠা - ৪০)

ওজনের এই মাপ বিপ্রদাস ছাড়া আর অন্য কোন কবির বর্ণনায় পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশ চিরদিনই ভূপ্রকৃতির আনুকূল্য পেয়ে সুজলা, সুফলা, শষ্যশ্যামলা। তাই প্রাকৃত ছড়া, চর্যাপদ, শূণ্যপুরাণ, প্রভৃতি প্রাচীনকালের রচনাগুলিতে কৃষিপণ্য রূপে ধানের উল্লেখ আছে। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে ধান চাষের কথা আছে — 'ধান্য নিড়াতে চাঁদের হাতে দিল কাঁচি' (বিঃগু / পৃষ্ঠা - ২৯৫)। ধানছাড়া ইক্ষু চাষের কথা বিপ্রদাসের কাব্য থেকে জানতে পারি। এছাড়া বিপ্রদাস জামিতে হালচাষের বর্ণনা দিয়েছেন —

শতেক কৃষাণ সদা আছে নিয়োজিত
চষিতে গমন কৈল বড় হরষিত। (বিঃপি/ পৃষ্ঠা - ৬৩)

জগজ্জীবন ঘোষাল দেবখন্ডে শিবের জমি চষার বর্ণনা দিয়েছেন।

হাল বাহে শিব কৌতুক বড় রঙ্গে।
বৃষহ জুড়িল হর খায় পান রঙ্গে।। (জঃঘো/পৃষ্ঠা - ২২)

জমি চাষের এই বর্ণনার তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় জগজ্জীবনের চাষ চষার বিবরণ অধিক জীবন্ত ও detail ধর্মী। তিনি বিবৃতির মাধ্যমে কৃষকের চাষ চষার দৃশ্যটিকে ছবির মতো দেখিয়েছেন।

মঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় তখন কৃষিজাত শষ্যের পাশাপাশি ফল চাষও হত প্রচুর পরিমাণে। ফল চাষ কৃষি কাজেরই অঙ্গ ছিল। কদলী, কর্কট, নারকেল, ফুটি, কাঁঠাল, খেজুর, সুপারি, আম, জাম, কলা (বিঃ পি/পৃষ্ঠা - ৯০) প্রভৃতি ফল চাষ হোত প্রচুর পরিমাণে। ভোজন রসিক বাঙালীর মুখশুদ্ধির জন্য আমলকি ও হরিতকী চাষ হত। (বিঃ পি/পৃষ্ঠা - ৯০)

উদ্যান পরিচর্যা সৌখিন বাঙালীর চিরকালীন অভ্যাস। মনসামঙ্গলের মাত্র দুজন কবি জগজ্জীবন ঘোষাল ও বিজয়গুপ্ত বাঙালীর এই অভ্যাসের চিত্রটিকে নিপুণভাবে তাঁদের কাব্যে তুলে ধরেছেন। জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে শিবের ফুলচাষ —

কদম্ব করবী আর চাপা নাগেশ্বর।
ওড় টগর পুষ্প বকুল সুন্দর।।
ভাঙ্গ ধুতুর পুষ্প আর পলাশ।
মাধবী লবঙ্গ পুষ্প সুগন্ধিত বাস।। (জঃ ঘো/পৃষ্ঠা - ৩১)

কিংবা বিজয়গুপ্তের কাব্যে দেবী চন্ডী কর্তৃক পুষ্পের চাষ বা নাখড়া উদ্যান রচনা করা, সমস্ত কিছুর বর্ণনায় কবিদের রোচিষ্ণু মনের প্রকাশ ঘটেছে। পাশাপাশি তৎকালীন বাঙালীর ফুলচাষের চিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে।

চাপা নাগেশ্বর জাতী লবঙ্গ মালতি যূতী
কেওয়া কেতকী বক ফুল।
টগর মাধবী লতা অশোক অপরাজিতা
বান্দুলি তিল দ্রোবন বকুল।।
গুলাপ মল্লিকা ধাই কুটজ কাঞ্চন জাই
কস্তুরি ধুতুরা সত বর্গ।।
তুলসীর ফুল যত তাহা বা কহিব কত
জবা পুষ্প দিতে সূর্য্য অর্ঘ।।
শ্যামলতা শ্রী ফল করবী পুষ্প কমল
ভুমিচাপা আর গন্ধরাজ।।
পলাশ সেরতী যত মাধবী দুলাল সত
সূর্য্যমুখী আর শেফালিকা।।
বিষ্ণুপদী চন্দ্রমণি নীলকণ্ঠ সূর্য্যমণি
জয়ন্ত বেল চন্দ্রমল্লিকা।।
ঝিকটা নন্দদুলাল ভাদ্বী কদম্ব ভাল
পুষ্প সব ফুটিছে বহুল।। (বিঃ গু/পৃষ্ঠা - ১৭)

রন্ধন প্রণালীর বর্ণনা সমগ্র মঙ্গলসাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্য। মনসামঙ্গলের কবিরা রান্নার যে বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন তা থেকে তৎকালীন সমাজের রান্নাবান্না সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করতে পারি। তখন রান্নায় নারীদের ছিল একচেটিয়া অধিকার। বিজয়গুপ্তের কাব্য থেকে জানা যায় তখন রন্ধন ক্রিয়াও একটা শিল্প কর্ম ছিল। বেহুলা রন্ধনশালায় প্রবেশ ও কর্মারম্ভের আগে দেবী মনসাকে স্মরণ করেছেন।

স্বর্গ পুরী বিদ্যাধরী মাগ মনেতে বাখানি।
নারীর প্রধান মাগ তোমারে সে গনি।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৩৩৯)

রন্ধন কার্যের জ্বালানী হিসেবে ইক্ষুপত্রের ব্যবহারের রীতি ছিল —

আড়াইটী ইক্ষুর পত্রে বাড়াইয়া জ্বাল। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৩৪০)

বণিক সমাজের জীবনযাত্রার ঐশ্বর্যোজ্জ্বল চিত্র পাওয়া গেলেও সে যুগে বহু মানুষের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। কেননা জেলে জীবনের প্রতিনিধি (জালু ও মালু) ও রাখাল বালক, ভাসান পর্যায়ে গোদা, বড়িসিয়া প্রভৃতি মানুষের বর্ণনা, এমন কি কেতকাদাসের আত্মজীবনী থেকে অন্ততঃ এটুকু উপলব্ধি করা যায় মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের তেমন অভাব না থাকলেও দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না। তবে কোনো কাব্যেই মানুষের দারিদ্র্য তেমন তীব্র রূপে প্রকাশিত হয়নি। কেতকাদাসের কাব্যে দেখা যায় বাঙাল মাঝিরা একটু পোস্ত, ছেড়া কাপড় বা একটি ছেড়া কাঁথার জন্য হাহুতাশ করেছে।

পোস্ত-হোলা ভাস্য গেল, ছাকনার কানি। আর বাঙ্গাল বলে গেল ছিড়া কাথা খানি।। (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ২৩১)

কেতকাদাস বাঙাল মাঝিদের 'রাঙাল' ভাষার টানে কান্না নিয়ে কৌতুক করলেও এই অংশে দারিদ্র্যের নিদারুণ স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়েছে।

আবার সামন্তশ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তি যত বেড়েছে ততই দরিদ্র প্রজাদের উপর অর্থনৈতিক চাপ বেড়েছে। সামন্তশ্রেণী প্রজাদের কাছ থেকে কর বা খাজনা আদায় করেছে। মনসামঙ্গলে বিভিন্ন ঘাটে কর আদায় থেকে পারানির জন্য মানুষদের যে মূল্য দিতে হত, আগে তা পারাপারের কাজে যারা রত ছিল তারা নিজেরাই মজুরী হিসেবে গ্রহণ করতো। কিন্তু এখন তার উপরে কিছু রাজস্ব দিতে হয়। সেই ক্ষোভে গোদা নদীর ধারে যে জলটুঙ্গি ছিল তা ভেঙ্গে দিয়েছে।

রাজত্য খাজনা আইল টেঙ্গ চুড়া কড়ি হইল
বেচিয়া দিলাম নালিয়া পাতার ডোলা। (নাঃদে/পৃষ্ঠা - ১১৯)

অনুমান করা যায় রাজস্ব আসার ফলে মানুষের দারিদ্র্য আরো বৃদ্ধি পায়।

মনসা মঙ্গলের কবিরা বিবাহরীতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখন তাই বিবাহরীতি নয় সে যুগের বহুবিবাহ রীতি নিয়ে আলোচনা করব। মনসামঙ্গলর কাব্যে অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা যায় কাব্যে কবিরা তেমনভাবে বহুবিবাহের উল্লেখ না করলেও পুরুষেরা যে বহুবিবাহ করতেন তা বোঝা যায়। গোদার একাধিক স্ত্রী, শিবের দুই স্ত্রী ইত্যাদি তথ্য তারই সাক্ষ্য বহন করে। তবে এক নারী একাধিক বিবাহ করতেন কি না জানা যায় না। বরং দ্বিজ বংশীদাসের একটি মাত্র সূত্র থেকে অনুমান করা যায় কোন নারীর স্বামী বর্তমানে বা অবর্তমানে পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সমাজে নিন্দনীয় ছিল। বেহুলার ভাসানের সময় নেতো মাসী রূপে বেহুলাকে ছলনা করতে গেলে বেহুলা তাঁর স্বামী পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করে। সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর না পেয়ে বেহুলা তখন স্বামী বর্তমানে একজন নারীর আলাদা ভাবে একাই গঙ্গাপাড়ে অবস্থান করাকে কটাক্ষ করে বলে "জীবিত স্বামীরে এড়ি গেল গঙ্গাপাড়ে ঘর।" (দ্বিঃব/পৃষ্ঠা - ৫৭৬) বেহুলার এই কটাক্ষে সমাজ মানসিকতার ইঙ্গিত আছে।

বারনারী বিলাসের কথাও মঙ্গলকাব্যে আছে। প্রাচীন বাংলার নিদর্শন চর্যাগুলিতে সে যুগের যৌন জীবনের অনিয়ন্ত্রিত রূপ পরিস্ফুট (২,১০,১৯ ও ৪৯ চর্যায়) হয়ে আছে। পরবর্তীকালের ষোড়শ শতকের সমাজ গণিকাবৃত্তিকে অস্বীকার করে নি। কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তী রচিত নব্য প্রতিষ্ঠিত নগরে, গণিকাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল স্বতন্ত্র পল্লীতে —

লম্পট পুরুষ আসে বারবধুগণ বৈসে

এক ভিতে হইয়া অধিষ্ঠান। (কঃচ/পৃষ্ঠা -৩৮)

কিন্তু মনসামঙ্গলে এরূপ কোন চিত্র নেই। তবে বিজয় গুপ্তের কাব্যে নৌবানিজ্যে চাঁদ সর্বস্ব হারিয়ে বনের কাঠ বিক্রি করে চারপণ কড়ি পায়। সেই চারপণ কড়ি কিভাবে খরচ করবে সে প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি —

এ (ক) পোন দিয়া আমি নটী নৃত্য চাব।

এক পোন দিয়া আমি সনকা ভেটিব।। (বিঃগু/পৃষ্ঠ - ২৯২)

এতে নটীর বারবণিতারূপী স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। স্ত্রী বর্তমানে শিবের অন্য নারী আসক্তি (ডোমনী সম্ভোগ) পুরষের বহুচারিতার প্রমাণ। বিজয়গুপ্তের কাব্যে শিব গৌরীর পুষ্পমালঞ্চে যেতে চাইলে পার্বতী বাধা দেন। শিবকে নিরস্ত করতে গিয়ে পার্বতী যে আচরণ করেন —

শিবেরে চঞ্চল দেখি জিজ্ঞাসে পার্ব্বতী।।

আজু কেনে তোমার মন না বুজি গোসাই।

আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবা কোন ঠাই।। (বিঃগু/পৃষ্ঠ - ১৪)

বা নারায়ণদেবের কাব্যে ডোমনীর প্রতি শিব যে লোলুপ দৃষ্টি দেন —

তব রূপ দেখি মোর দহে কলেবর।

আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর।। (নাঃদে/পৃষ্ঠ - ১০)

তাতে অনুমান করা যায় পুরুষেরা অনেকেই ছিলেন বহুচারি। চাঁদকে ছলনা করার জন্য মনসার রূপসী নটীবেশ ধারণ, কখনো বা শ্যালিকা রূপ ধারণ, সমাজে নারী পুরুষের বিবাহাতিরিক্ত অন্য একটি সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। এর অতিরিক্ত উত্তরবঙ্গের কবিগণ যুবক লখিন্দরকে দিয়ে মামীর উপর বলাৎকার ঘটিয়েছেন। এই ঘটনা সমাজের নৈতিক অধঃপতনের ইঙ্গিত দেয়। এই প্রসঙ্গে কবিরা তখন সমাজে দাসী রাখার কথা বলেন। বিবাহেচ্ছু লখিন্দর বাবা মায়ের উপর অভিমান করে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে দ্বার অবরুদ্ধ করে রাখলে মা সনকা একশো দাসী দিয়ে তার মানভঞ্জনের চেষ্টা করেন ।

দ্বার ঘুচাও বাছা কর স্নান ভোজন।

দাসী করি দিব একশত নারীগণ।। (জঃঘো/পৃষ্ঠা - ১৬১)

মনে হয়, সমাজে দাসী রাখার প্রথা ছিল এবং দাসীরা উপপত্নী রূপে গণ্য হত।

মনসামঙ্গল কাব্য থেকে সামাজিক এই সমস্ত রীতিনীতির পাশাপাশি পালনীয় আচার সংস্কার (অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, পারলৌকিক কৃত্য, সহমরণ প্রভৃতি) প্রণালীরও কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়।

যদিও মনসামঙ্গল কাব্যে লখিন্দরের ও চাঁদের অন্যছয় পুত্রের শবকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল তথাপি মনসা মঙ্গলের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সাক্ষ্য থেকে বলা যায় সাপে কাটা ব্যক্তি ছাড়া অন্যক্ষেত্রে শব দাহেরই রীতি ছিল —

পাত্রমিত্র পুরোহিত বলে সম্বিধান
অগ্নিকার্য্য শ্রাদ্ধ কর শাস্ত্রের বিধান। (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ১৩২)

দাহের জন্য কাঠের (চন্দন) চুল্লি সাজিয়ে শবদেহকে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে সারা শরীরে চন্দন লেপে চুল্লির উপর চড়ানো হত। তারপর পুত্র সন্তানেরা সাতবার প্রদক্ষিণ করে শবের মুখাগ্নি করত। মুখাগ্নি শেষে চিতায় ঘি ছিটিয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলন ছিল আচারের প্রধান অঙ্গ —

আপনার উরু তুলি তাহাতে বান্ধিআ চুল্লি
বাপের করয়ে অগ্নিকাজ।।
গঙ্গাসাগরের পানি আগর চন্দন আনি
ধর্ম্মদেবের শরীর ধোঁয়ায়।
করিয়া উত্তম খাট চাপায় আগর কাঠ
তাতে নিআ ধর্ম্মকে শোয়ায়।।
আগর চন্দন খড়ি চাপায় অনেক করি
আনল ভেজায় তিন ভাই।। (জঃঘো/পৃষ্ঠা - ১৩)

তারপর 'কুলাচার ও বেদবিহিত' শাস্ত্রবিধানে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হতো। গঙ্গায় পিন্ডদান, স্নান ও তপস্যা ছিল শ্রাদ্ধেরই অঙ্গ।

করিলেক তর্পণ পিন্ড দিল তিনজন
তপস্যাকে চলিল সাগরে। (জঃঘো/ পৃষ্ঠা - ১৪)

বিপ্রদাস ও জগজ্জীবন ছাড়া অন্য কোন কবির রচনায় এরূপ বর্ণনা নেই। এই দুই কবির বর্ণনায় দেখা যায় বিপ্রদাসে অগ্নিকার্য্যের বর্ণনা থাকলেও তা কিভাবে করা হোত তার কথা নেই। কিন্তু জগজ্জীবনে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তাই সমাজ চিত্র হিসেবে জগজ্জীবনের রচনা বেশী জীবন্ত ও প্রাণবন্ত।

মনসামঙ্গল কাব্যের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সূত্র থেকে সেকালে সমাজে সহমরণ প্রথার উল্লেখের অপ্রতুলতা হেতু অনেকে অনুমান করেন সে যুগে এই প্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল না। চাঁদ সদাগরের ছয়পুত্রের অকালমৃত্যু হলে তার পুত্রবধূরা অনুমৃতা হয়েছিলেন, উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল ছাড়া এমন বর্ণনা অন্য কোন কবি করেন নি ।

যতেক বানিয়াগণ লৈয়া তৃণ কাষ্ঠ
মরা ছয় লইয়া যায় গগরির ঘাট।।
ছয়বধূ অনুমৃতা যায় ছয় ঠাঁই।
ছয়চিতা নির্ম্মাইল আনল জ্বালাই।।
পদ্মা বোলে নেতা পাত্র কথাএ দেহ মন।
অনুমৃতা যাবে বানিয়ার বধূগণ।। (জঃঘো/পৃষ্ঠা - ১১৮)

তবে চাঁদের ছয় পুত্রবধূ শেষ পর্যন্ত রাজী হয় নি। নেতোর পরামর্শে মনসার কৌশলে তারা রক্ষা পায় এবং শ্বশুরালয়ে দিন যাপন করতে থাকে। অন্যাদিকে জগজ্জীবনের কাব্যেই দেবখন্ডে মনসা কামিনীর সতী হওয়ার দৃশ্যও লক্ষ্য করা যায় —

চিতা প্রদক্ষিণ দেবী করে সাত বার।
চিতাত শুতিলা মনে ভাবিয়া অসার।।
চারিদিকে তিন ভাই ভেজায় আগুনি।
আনলে পুড়িয়া মরে মনসা-কামিনী।। (জঃঘো/পৃষ্ঠা - ১৬)

পাশাপাশি বিপ্রদাসের কাব্যে শিবের শব দাহ করার কথা থাকলেও পুড়ে মরতে দেখা যায় না —

তবে সর্বদেবগণ চন্ডিকার বোলে
করিল বিচিত্র চিতা ক্ষীরোদের কূলে।
দিলেন চন্দন-কাষ্ঠ ঘৃত বহুতরে
করাইয়া স্নান শোয়াইলা গঙ্গাধরে। (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ৩৭)

তন্ত্রবিভূতির কাব্যে দেখি মনসার নির্বন্ধে সাবিত্রী ও সত্যবান মর্ত্যে পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়। তাঁরা অগ্নিতে স্বর্গীয় কায়া আহুতি দিয়ে মর্ত্যে বেহুলা ও লখিন্দর রূপে জন্ম গ্রহণ করে।

অগ্নিকুন্ড সাজাইঞা তাহা প্রদক্ষিণ হৈঞা
ঝাপ দিল মনসা স্বঙরি।।
কুমার সে ঝাপ দিল সাবিত্রী তাহা দেখিল
আপনি পড়িল ঝাপ দিঞা।। (তঃবি/পৃষ্ঠা ঃ ২২৪ - ২৫)

মনসামঙ্গলের উপরের তিনজন কবির এই বর্ণনা থেকে সহমরণ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কেননা জগজ্জীবনেই দুই পরস্পর বিরোধী রূপ আছে। তাই এ প্রসঙ্গে আমাদের অনুমান হল ঃ—

(ক) হয়তো সপ্তদশ শতকে এই প্রথা সমাজে কিছুটা প্রসার লাভ করেছিল বা উত্তরবঙ্গে এই প্রথার প্রচলন বেশী ছিল বলে তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন প্রমুখ কবির দৃষ্টি তাতে পড়েছিল।

(খ) পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে এই প্রথার তেমন প্রচলন না থাকায় অন্যান্য কবিদের দৃষ্টি এতে তেমনভাবে পড়ে নি। বিপ্রদাস শুধু উল্লেখ করেছেন মাত্র।

তবে এটা ঠিক সমাজে সহমরণ প্রথা কঠোর ভাবে মানা হোত না। কেননা সব মনসামঙ্গল কাব্যেই বেহুলার ভাসানের ঘটনায় এর বিরোধী চিত্র আছে। বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভেসে যাওয়ার সংকল্প করলে আত্মীয় স্বজনেরা তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে, বাড়ীতে থাকতে উপদেশ দিয়েও ব্যর্থ হন। বেহুলা স্বর্গে গিয়ে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার সংকল্প করায় সে কথা শোনে নি।

বাঙালী জাতি চিরকালই ধর্মপ্রাণ। মনসামঙ্গল কাব্যগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করেছে। কবিরা বন্দনাংশে যে সমস্ত দেবদেবীর নামোল্লেখ করেছেন তা থেকে অন্ততঃ এটুকু স্পষ্ট হয় শিব, চন্ডী, গৌরী, সিদ্ধিদাতা গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীর আরাধনা সমগ্র বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। বিশেষ ভাবে পুরুষশাসিত উচ্চবংশীয় বণিক সমাজে চন্ডী বা গৌরী সম্ভ্রম আদায় করে নিলেও মনসা প্রভৃতি দেবীরা স্থান পান নি। তবে বণিক নারী সমাজে তাঁদের কিছুটা প্রভাব ছিল।

সনকা সম্বন্ধে বিজয়গুপ্ত বলেছেন —

(ক) শিশু হইতে পোজে সে পদ্মার চরণ।
পদ্মার চরণ বিনে অন্য নাহি মন।।
মনসার ঘট করিল স্থাপন।
বিবিধ প্রকারে পূজে পদ্মার চরণ।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ১৪৬)

(খ) এতেক বচন সুনি কহে জত রমণী
আমরা পূজি ব্রাহ্মণী তোতলা।
সোনকা পুছেন তারে কেবা কোন পায় বরে
কিনা বিধি কহত তাহার। (তঃবি/পৃষ্ঠা - ৮৯)

এ থেকে বলা যায় নারী সমাজে মনসা পূজার প্রচলন ছিল। দেবদেবীর পূজায় তখন সম্পন্ন লোকেরা সোনার ঘট ব্যবহার করতেন।

(ক) সোবর্ণ্যের ঘট আর সোবর্ণ্যের আসন। (নাঃদে/পৃষ্ঠা - ২৮৪)

(খ) সোনার প্রতিমা সাধু করিলা গঠন।
সমুখে সুবর্ণ ঘট করিল স্থাপন।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৫৩৭)

তারপর ঘটের সামনে সিজ গাছ পুতে, বিচিত্র মাটির সরায় আতপ চাল, দুধের মিশ্রণে তৈরী নৈবেদ্য কলা ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হত।

আখন্ড সিজের ডাল করিয়া রোপণ। আতব তন্ডুল কলা নানা আয়োজন।। (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ২৯০)

পূজার সময় বিভিন্ন রাজনা সহযোগে নৃত্যগীতেরও চল ছিল। পুজা শেষে বিভিন্ন পশু (ছাগ, মহিষ, ভেড়া) ও পক্ষী (হাঁস, কবুতর) বলি দেওয়া হত।

(ক) খই দধি রচনা সাধু থুইল ঠাই ঠাই।
ছাগ মহিষ দিল লেখা জোখা নাই।।
নর্ত্তকীয়ে নৃত্য করে গাইনে গীত গায়ে।
ঘটে অধিষ্ঠান হইল জগতগৌরী মায়ে।। (বিঃগু/ পৃষ্ঠা - ৫৩৯)

(খ) শত শত ছাগল আনে মহিষ অপ্রমাণ।।
বলিদান করি সাধু পূজা বিসর্জ্জিল।। (তঃবি/ পৃষ্ঠা - ৫৪৮)

বস্তুতঃ হোমাগ্নির ধুঁয়ায় ও ভক্তদের ভক্তিযুক্ত প্রার্থনায় পূজাক্ষেত্র জমজমাট আসরের রূপ পেত।

মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্তের রচনায় স্নানক্রিয়ার বিস্তৃত পরিচয় আছে। তিনি বালক লখিন্দর ও বেহুলার স্নানের বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে স্নান করতে যাওয়ার আগে মা সনকা উত্তমরূপে লখিন্দরকে তেল মাখান।

স্নান করাইয়া জলে মাঠুর মাথায় তৈল ডালে
জয়ে ধ্বনি দিল সর্ব্বজন। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৩০২)

তখন স্নানপর্ব চলতো নদীতে কিংবা প্রশস্ত পুষ্করিণীতে। নারী পুরুষ উভয়েই তাতে স্নান করলেও নারীরা সাধারণতঃ দলবদ্ধ হয়ে সঙ্গীসাথী নিয়ে বেশ আমোদ সহকারে গল্পগুজব করতে করতে স্নানে যেত —

বেউলা সাহের কুমারী
আগে পাছে সখীগণ চলিল সারি সারি। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৩২৩)

যুবতী নারীরা আনন্দে এতটাই মুখর হয়ে যেত যে, তাতে ঘাটে উপস্থিত প্রৌঢ়ারা অতিষ্ঠ হয়ে অভিসম্পাত দিতেন —

জলকেলি করে বেউলা গোলুনি মারে পায়ে।
গোলানির জল গেল মনসার গায়ে।।
এতেক দেখিয়া যতি ক্রুদ্ধ বড় হইল।
বেউলারে শাপ দিতে হাতে জল লইল।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৩২৬)

হয়তো এরূপ বিচ্ছিন্ন ঘটনায় ঘাটের পরিবেশ সাময়িকভাবে ভারাক্রান্ত হতো। কিন্তু চলমান জীবন প্রবাহে তা বিন্দুমাত্র রেখা পাত করতো না। উৎসবমুখরতা চলতো নিজ পথ ধরেই। মনসামঙ্গলের অন্য কবি

বিপ্রদাসে স্নান পর্বের শুধুমাত্র উল্লেখ আছে কিন্তু বিস্তৃত কোন বর্ণনা নেই।

প্রসাধন পরিচর্যায় মনসামঙ্গল কাব্যে নারীরা ছিলেন পুরুষের তুলনায় অনেক এগিয়ে। নারীরা চিরুণী দিয়ে কেশ সংস্কার করতেন। ধূপের গন্ধে চুলকে সুগন্ধী করার রীতিটিও সমাজে প্রচলিত ছিল— 'ধূপের ধুয়া দিয়া শুখায়ে মাতার কেশ।' (জঃঘো/পৃষ্ঠা - ২৬৩)। রঙিন পট্টবস্ত্র ও নানা বর্ণের কাঁচুলি পরে নারীরা রূপবতী হয়ে উঠতেন।

কাঁচুলী পরিয়া হইল ত্রৈলোক্যসুন্দরী। (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ১৮৯)

প্রসাধনের জন্য ধনী রমণীরা সোনার আয়না ও সোনার চিরুণী ব্যবহার করত। রমণীরা নয়ন মনোহর রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য খোঁপায় নানারকম ফুল ও জরি গেঁথে নিত। গায়ে যবচূর্ণ ও হলুদ বাটা ('হরিদ্রা বাটিয়া দিল বেহুলার গায়' (বিঃপি/পৃষ্ঠ - ১৯৩ বাইশা) মেখে রঙ ফর্সা করার রীতিটিও জানা ছিল। এছাড়া কঙ্কণ, বাহুটি, কেশর, পাসলি নানারকম মালা ছিল রমণীদের অতিপ্রিয় অলঙ্কার। ধনাঢ্য পুরুষেরা নানারকম অলঙ্কার পরতেন। যুবক লখাই কানে দুল, গলায় মালা, বাহুতে বাহুটি পরে রূপে অনুপম হয়ে উঠেছিল। তখন শিশুদের গলায় থাকতো সোনাবাঁধানো জীবজন্তুর নখ, হাতে মগরাখাড়ু ইত্যাদি। তবে দরিদ্র্যের তা জুটতো না।

মনসামঙ্গল কাব্য থেকে জানা যায় তখন পান বা গুয়ার ব্যবহার ছিল ব্যাপক। পান দিয়ে যেমন মুখের শোধন করা হোত তেমন বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে পানের ব্যবহার ছিল মঙ্গলসূচক। তাড়কা রাক্ষসী লখিন্দরের বিয়ের ভাত রান্না শুরুর আগে পান দিয়ে মুখের শোধন করেছে। (নাঃদে/পৃষ্ঠা - ৫০) আর এয়োরা লখিন্দরকে বরণ করার সময় পান নিয়ে এগিয়ে গেছে —

কোন নারি লইলেক গঙ্গাজল ভরি।
কেহ লইল পুষ্প মালা আগর কস্তুরি।।
বাটা ভরি গুয়া পান লইল তখন।
লখাইর নিকটে জায়া দিল দরশন।। (নাঃদে/পৃষ্ঠা - ৫১)

এছাড়া কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে গুয়া পান দেবার প্রথা ছিল।

(ক) পুষ্প পান দিয়া দেবী তার তরে বলে। চাঁদ বান্যার সাত ডিঙ্গা বুড়াইবে জলে।। (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ২৩০)

সম্ভবত গুয়াপান একটু সম্মানজনক কোন কাজের স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়ার প্রথা ছিল।

(খ) চাঁদো বলে আঠারো বাকড়া নাম বলো।
তবে গুয়া পান দিব না কর কোন্দল।। (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ১৮৫)

তখন বিয়েতে শোভাযাত্রা সহকারে গমন করা হত। ধনী ব্যক্তিরা শোভাযাত্রায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে সাক্ষী (বরযাত্রী) হিসেবে নিতেন। ধনীরা এর অতিরিক্ত নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণে নিজ সৈন্যবাহিনীকে শোভাযাত্রায় সঙ্গী করতেন।

চাদো বোলে সুন খুড়া বচন আমার।
কাহারে পাঠাইয়া দিব কন্যা যুড়িবার।।
কন্টক সহিতে জদি না জাই আপনে।
উপহাস্য তবে করিব সর্ব্বজনে।। (নাঃদে/পৃষ্ঠা - ২৮)

সেনারা নিজস্ব বাহন (হাতী, ঘোড়া) ও খাদ্যসম্ভার সঙ্গে নিত এবং বাজনা বাজাতে বাজাতে অগ্রসর হত।

কোটি কোটি সেনা সাজি লক্ষ লক্ষ গজরাজি
বাদ্য বাজে যাহার পঞ্চাশ।।
* * *
হাতী ঘোড়া আসোয়ার লেখা জোখা নাই তার
সানকি করায়া লক্ষ ভার।
* * *
ঢাক কাঢ়া আর ঢোল মহাশব্দে গন্ডগোল
বেণু বীনা পিনাক সাহিনী।
কবিনাস সপ্ত স্বরি স্বর মন্ডল মোহরী
বাজে বাদ্য দশ অক্ষৌহিনী। (জঃঘো/পৃষ্ঠা - ১৭৮)

তখন সাধারণ মানুষ যাতায়াত করতো পদব্রজে। সম্পন্ন লোকেরা দোলায় চড়তেন। তাঁদের সামনে ও পেছনে কমপক্ষে দশ বিশজন সশস্ত্র পাইক বরকদাজরা থাকতেন। এই দোলা ছিল নানরকম — সাহেবজান দোলা (ঝালরের টোপ দিয়ে ঘেরা দোলা) ও চৌদুলি বা চৌদোলা ইত্যাদি। মনসামঙ্গল কাব্যের কবি বিজয়গুপ্তের উল্লেখ থেকে —

লোক সব চলিয়াছে করে গন্ডগোল।
আশীখান চলিয়াছে সোনার চৌদল।। (বিঃগু/পৃষ্টা - ৩৭০)

বোঝা যায় চৌদুলিরই ব্যবহার ছিল বেশী। এই চৌদুলির কথা একমাত্র বিজয়গুপ্ত উল্লেখ করেছেন।

তখন সংবাদ প্রেরণের মাধ্যম ছিল পক্ষী। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলার অকালবৈধব্যের সংবাদ বেহুলা মায়ের কাছে পাঠান কাক পক্ষীর মাধ্যমে।* এই সংবাদবাহী কাকপক্ষী মানুষের মত কথা বলতে পারতো। এখানে কাকের মানুষের মত কথা বলার মাধ্যমে কবিরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কাকের কথা বলেছেন। এই কাকেরা খবর পৌঁছে দেওয়ার ব্যপারে ছিল সিদ্ধহস্ত।

* তৃতীয় অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীপথে পারাপার বা গমনাগমনের রীতিটি অতিপ্রাচীন। প্রাচীনকালের চর্যাপদ থেকে মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যেও এর উল্লেখ আছে। পারাপারের কাজে নারীদেরই ছিল একচেটিয়া অধিকার। পারাপারের জন্য পারানি দিতে হোত। পারানি মেটাতো হতো কখনো নগদ মূল্যে, কখনো বা উপযুক্ত জিনিসপত্রের বিনিময়ে। নৌকায় তখন মনুষ্যেতর জীবও পার করা যেতো। তবে এজন্য পারানি লাগতো অনেক বেশী। যদি এসমস্ত জীব পার করতে গিয়ে পারানিতে না পোষাতো ('থুইয়া যাব বলদ তোমার কৌড়ির কারণ' /বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৩৬) তাহলে তাদের (মনুষ্যেতর প্রাণীদের) নদী সাতার দিয়ে পার করানো হোত। নারীরা নৌকা পারাপারের কাজে লিপ্ত থাকায় তাদের নিরাপত্তা যে সর্বদা অটুট থাকতো তা কিন্তু নয়। অনেক সময় অসময়ে পার করতে গিয়ে পার হতে আসা ব্যক্তির নিকট (শিবের নিকট ডোমনীর অপমান/বিঃগু/পৃষ্ঠা - ১৪, নাঃদে/পৃষ্ঠা - ১১) তাঁদের মান সম্ভ্রম খোয়াতে হত।

যাত্রাকালে শুভাশুভ নির্ণয় ছিল সেকালে অত্যন্ত কার্যকরী। গমন লগ্নে হাঁচি, জেঠির বাধা —

হাঁচি জেটী পড়ে জবে যাত্রা করে রায়
সনকা রমণী কর হানয়ে মাথায়। (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ১৪০)

পায়ে উঝট লাগা বা শৃগালের রাস্তা দিয়ে বাম দিক থেকে ডান দিক অতিক্রম করা কিংবা যাত্রাকালে শকুনের দর্শন সবই ছিল অমঙ্গলের পরিচয়বাহী।

চরণে উঝটি লাগে সগুনি আইল আগে
শৃগাল যায় দক্ষিণভাগে
সনা বলে প্রাণনাথ করু প্রভু যোড় হাত
যাত্রায় অমঙ্গল সব লাগে। (জঃঘো/ পৃষ্ঠা - ১২৫)

বিষ্ণুপালের কাব্যে যাত্রাপথের ডানদিকে কোন মানুষের হাঁচি বা বাম দিকে যাত্রাকালে টিকটিকির আওয়াজ ছিল অমঙ্গলের পরিচয়বাহী।

ডাহিনে হাঁছিল বধূর বাঁমে টীক টীকায়। (বিঃপা/পৃষ্ঠা - ৩৯)

যাত্রাপথে এই অমঙ্গলসূচক চিহ্নের পাশাপাশি যে সব চিহ্ন বা লক্ষণকে মঙ্গলের সূচক বলে ধরা হোত তা একমাত্র বিপ্রদাস তাঁর কাব্যে বর্ণনা করেছেন। যাত্রাকালে সামনে পূর্ণ ঘট রেখে ব্রাহ্মণগণের বেদমন্ত্র উচ্চারণ, শঙ্খধ্বনি সহযোগে নানা বাদ্যযন্ত্র বাজানো ছিল মঙ্গলের পরিচয়বাহী।

মনসামঙ্গল কাব্য থেকে জানা যায় তৎকালীন সমাজ ছিল যৌথ পরিবার ভিত্তিক। ক্ষেত্র বিশেষে শাশুড়ি, ননদী বিহীন স্বামী স্ত্রীর (ধন্বন্তরী ওঝা ও পদ্মা) একক পরিবারের উল্লেখ থাকলেও চাঁদের সাতপুত্র

ও পুত্রবধূ নিয়ে বৃহৎ সংসার, উজানী নগরের সাহো সদাগরের বৃহৎ পরিবার সবই যৌথ পরিবার ভিত্তিক জীবনের কথাই জানায়। বাড়ীর পুরুষেরা বাইরে বিভিন্ন কাজে রত থাকত। তাই এই যৌথ পরিবারভিত্তিক সংসারের ভার নারীর হাতে ন্যস্ত থাকত। নারীদের অবসর সময় কাটতো প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুখ দুঃখের গল্পে। অনেক সময় নারীরা বাড়ীতে নিজ নিজ স্বামীদের সঙ্গে তাশ, পাশা, দাবা খেলে আবসর যাপন করত।

সর্বাঙ্গসুন্দর নাম পুরন্দর
পাশা খেলে ভার্য্যা সনে। (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ১২৭)

নারীরা বিদ্যালয়ে বা টোলে পড়াশোনার জন্য যেতেন কি না তা মনসামঙ্গল কাব্য থেকে জানা যায় না। তবে লখিন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলা মাকে যে পত্র লেখে তাতে এটুকু অন্ততঃ বোঝা যায় সম্পন্ন বাড়ীর মেয়েরা ন্যূনতম পড়াশোনাটুকু জানতেন। এর পাশাপাশি মেয়েদের নৃত্য শেখারও চল ছিল। 'শিশুকাল হৈতে কন্যা শিখে নৃত্যগীত।' (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ২৩৯) পুরুষদের মধ্যে পড়াশোনার চল ছিল। সে যুগে চৌষট্টিকলার মতো বিদ্যাও ছিল চৌষট্টি প্রকার। বিপ্রদাসের কাব্যে বর্ণিত 'লখিন্দরের বিদ্যারম্ভ' শীর্ষক অংশ থেকে তৎকাল প্রচলিত পাঠ্যক্রমের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া যায় —

ক খ গ ঘ ঙ পড়ে হরিষ অন্তরে
চৌত্রিশ অক্ষর পড়ে বালা লখিন্দরে।
অষ্টাদশ ফলা পড়ে হরষিত-মন
চৌত্রিশ অক্ষরে ফলা করিল পঠন।
অষ্ট ধাতু অষ্ট শব্দ পড়িল সত্বরে
সোমাই পণ্ডিত দ্বিজ শুভদিন করে।
শাস্ত্রশাল লইলেক বালা লখিন্দর
প্রথমে পড়ায় সূত্র সুখে দ্বিজবর।
তারপর ব্যাকরণ পড়ে রাজসুতে
ভট্টি রঘু সাহিত্য পড়িল হরষিতে।
অলঙ্কার কুমার পড়িল অভিধান
জ্যোতিষ নাটক কাব্য পড়িল বিধান।
অষ্টাদশ পুরাণ পড়িয়া অনিবার
হইল পন্ডিত বড়ো রাজার কুমার।
সকল সন্ধান শিখে ইঙ্গিতে সকল
লক্ষ মাত্র উপাধ্যায় পড়া এ অনুবল।
পড়িল চৌষট্টী বিদ্যা সব একে একে
জানিল সকল বিদ্যা কহিল কৌতুকে। (বিঃপি/পৃষ্ঠা-১৫৩)

তন্ত্রবিভূতির কাব্যেও অনুরূপ পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রমের তালিকা আছে।

প্রথমেত পড়ে বালা ই পঞ্চ আখরে।
ক খ গ ঘ ঙ পঢ়ে দেবী পদ্মার বরে।।
ছত্তিস অক্ষর বালা করিলা পঠন।
ফালা পঢ়ি নাম লেখে সাধুর নন্দন।।
অষ্ট ধাতু অষ্ট শব্দী করিলা পঠন।
অমরসিংহ পঢ়ি লেন সাধুর নন্দন।।
সকল পঢ়িয়া বালা পারগ হইল।
ব্যাকরণ আদি শাস্ত্র পড়িতে লাগিল।। (তঃবি/পৃ-২৩৪)

এই দুই বর্ণনা থেকে আমরা তখনকার বাংলাদেশে প্রচলিত পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারি।

তখন সমাজে তাস, পাশা খেলার পাশাপাশি জুয়া খেলারও প্রচলন ছিল বলে মনে হয়। সেই সময় অনেক অকর্মণ্য ব্যক্তি জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে যেতেন। মনসামঙ্গল কাব্যে জুয়ারীর ঘাট আছে। জুয়া খেলা বহু প্রচলিত ছিল এটা তার প্রমাণ। শুধু ঘরের দ্রব্যাদি, ধন সম্বল নয় জুয়ারীরা নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত জুয়ায় বাজী রাখত।

বাপের ধন হারাইলাম করি অবহেলা।
সকল ধন হারাইলাম খেলাইয়া খেলা।।
কাইল খেলায়ে হারিয়াছি ঘরের নারী।
সেই খেলা অভাগিয়া পাশারিতে নারি।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা-৪৬৩)

জুয়া ছাড়া অকর্মণ্য পুরুষের (গোদার) সারাদিন ছিপ ফেলে মৎস শিকারের কথাও মনসামঙ্গল কাব্যে আছে। এ থেকে সাধারণভাবে সেকালের মানুষদের কাজের অভাব কিংবা সমাজের একাংশের নিষ্কর্ম অবস্থায় আলস্যে দিনাতিপাত করার কথা অনুমান করা যায়।

মনসামঙ্গল কাব্যের কিছু কিছু বর্ণনা থেকে সেকালের ব্যাধি ও তার চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হয়। পিত্তরোগ, ঘা, সর্প দংশন ইত্যাদি ব্যাধির সংবাদ মনসামঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়। তখন ক্ষত বা ঘা 'সালি বিসালি সহ সমুদ্রের ফেনা' ডাব ও নারকেলের জল দিয়ে নিরাময় করা হত।

(ক) সালিবিসালি গাছ ঝাটো আন গিয়া
প্রাণ রাখ ঘা মুখে দেহ ত বাটিয়া।
* * *
তবে সঙ্ক বলে শুন অরে ধনা মনা
সমুদ্রে ঔষধ আছে সমুদ্রের ফেনা। (বিঃপি/পৃষ্ঠা-১১১)

শুধু তাই নয় হলুদ দিয়ে ব্যাধি নিরাময়ের ধারনাও সমাজে প্রচলিত ছিল।

হরিদ্রা দেখায় চাঁদো করিয়া মন্ত্রণা
ইহাতে খন্ডয়ে যত ব্যাধির বেদনা। (বিঃপি/পৃষ্ঠা-১৪৯)

সর্পদংশনের জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ওঝা গুণীনদের নিয়মিত ডাক পড়ত। তারা নানা মন্ত্র পড়ে বিষ ঝাড়তেন (পূর্বে আলোচিত)। সুপ্রসবের ব্যাপারে মন্ত্রপূত জল ছিল সবিশেষ ফলপ্রদ।

সব সমাজেই মানুষ কিছু কিছু পাপ করে এবং তার জন্য বিবিধ প্রকার শাস্তি নির্দিষ্ট হয়। আলোচ্য সময়ে কেউ পাপ করলে প্রায়শ্চিত্য করতে হোত। গোহত্যা ব্রাহ্মণহত্যা, সুরাপান, দুধ খাওয়া, গোশাবক (কুইল্যাবাছুর) এর উপর অত্যাচার বা নারীজাতির উপর অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগ করার চেষ্টা করা বা স্ত্রী হত্যা (বিঃপা/পৃষ্ঠা - ৬৫) করলে সমাজের চোখে তারা পাপী বলেই পরিগণিত হতো। তখন মামাশ্বশুর ভাগ্নেবধূর মুখদর্শন করতেন না। যদি কোন কারণে মুখদর্শন করতেন তবে নিজেকে পাপী বলে মনে করতেন।

অধর্মের চিহ্ন হইল নরকে গমন
ভগিনা বধূর মুই দেখিনু বদন। (যঃদ/ পৃষ্ঠা-২১৭ বাইশা)

তবে এসব পাপ করলে যে সমাজের কঠোর শাস্তির বিধান ছিল তা কিন্তু নয়। কেবলমাত্র প্রায়শ্চিত্য করলেই পরিত্রাণ পাওয়া যেত। জগজ্জীবন ঘোষালের বেহুলা ভ্রাতাদের উদ্দেশ্যে প্রায়শ্চিত্যের বিধান দিয়ে বলেছেন —

উচ্চে দিঅ সরোবর নীচে দিঅ আলি।
ব্রাহ্মণকে দিহ ধেনু উত্তম দুধালি।।
অন্ন দেহ দাদা গ্রীষ্মকালে পানি।
বস্ত্রদান করিহ বিবস্ত্র জন আনি।।
ব্রাহ্মণকে আনি দাদা করাবে ভোজন।
তবে সে তুমার পাপ হইবে বিমোচন।। (জঃঘো/পৃষ্ঠা-২৮৫)

তখন সমাজে জাতিনাশ ছিল বড় রকমের শাস্তি। নেতা চাঁদের জাতি নাশ করেছেন বাবকের অন্ন খাইয়ে।

নেতা বলে স্থির কর হিয়া।
চান্দোর জাতি যায় বাবকের অন্ন খাইয়া।। (বিঃগু/পৃষ্ঠা-৩০৫)

তবে গুরুতর অপরাধ করলে দৈহিক নির্যাতন করে শাস্তি দেওয়া হোত। তাতেও যখন নিবৃত্ত করা যেত না তখন দৈবী শক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া হোত। সমাজের মানুষও বিশ্বাস করতেন মনসার মতো প্রচন্ড দৈবী শক্তি সমস্ত পাপীকে শাস্তি দিয়ে ন্যায়ের ধ্বজাটিকে তুলে ধরবে।

আমরা বিভিন্ন কবির বর্ণনা অনুসরণ করে মনসামঙ্গল কাব্যে প্রতিফলিত সমাজচিত্রের রূপ অনুসন্ধান করলাম। কবিরা প্রচলিত কাহিনী নিয়ে প্রথানুমোদিত পথে কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যের কাল পরিসীমাও বহু ব্যাপ্ত। এর ফলে কবিদের ব্যক্তিগত সময় এবং সমাজ পরিবেশ তাঁদের কাব্যে ছায়াপাত করেছে। কিন্তু যেহেতু কাব্যধারা প্রথা নির্দিষ্ট সুতরাং সেই সমাজের ছায়াকে সর্বত্র খুব স্বাধীনভাবে লক্ষ্য করা যায় না। তাকে কাহিনীর বিভিন্ন স্তর উপস্তরের মধ্যে খুঁজতে হয়। এবং এতেও সেই সব সমাজের অর্থনীতি, সমাজনীতি, জীবনধারণের প্রত্যহিকতার চিত্র, মানুষের দিন যাপন তার জাগতিক জীবনের নানা দিক কাব্যের মধ্যে স্পষ্ট হয়। এইসব বর্ণনার মধ্যেও কবিদের কিছুটা ধারাগত আবার একই ধারার বিভিন্ন কবির মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র্যতার আভাষ পাওয়া যায়। খুব স্পষ্ট আকারে তা হয়তো ধরা পড়ে না, তবু বলা যায় দু' একটি ক্ষেত্রে এই ধারাগত স্বাতন্ত্র্য অতিশয় স্পষ্ট। উত্তরবঙ্গের কাব্যধারায় মামীহরণ প্রসঙ্গ অন্যকোন ধারার কাব্যে নেই। এটা একটা স্পষ্ট ধারাগত স্বাতন্ত্র্য। আবার বিষ্ণুপালের কাব্যে মুসলমান সান্ত্রীবেশে শিবের আচরণ গোটা মনসামঙ্গল কাব্যের ধারায় আর কোথাও পাওয়া যায় না। এটা কবির নিজস্বতার প্রকাশ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমাজের বর্ণনার ক্ষেত্রে মনসামঙ্গলের কবিদের ধারাগত ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা সম্ভব।

সূত্র নির্দেশিকা

১। বন্দ্যোপাধ্যায় অনিলচন্দ্র, মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা - ৫৬

২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৩

৩। রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দেশপরিচয় অংশ, পৃষ্ঠা - ৯৮

৪। রাণা ডঃ সুমঙ্গল, ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা সমাজ ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা - ৬২

৫। মজুমদার ডঃ রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), দ্বিতীয়খন্ড, পৃষ্ঠা - ২১৬

৬। ভট্টাচার্য আশুতোষ, মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৩৪৫